রাজ্য সরকারের নয়া কৃষিনীতি

শঙ্কর ঘোষ

ঃ সর্বনাশের নীল নকশা শিল্পাঞ্চল

দু'হাজার সালের শেষদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জাতীয় কৃষি নীতি গ্রহণ করে। এই নীতির উদ্দেশ্য ব্যাকা করে তখনকার কৃষিমন্ত্রী নীতীশকুমার বলেছিলেন, 'কৃষি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও ঝিবাণিজ্য সংস্থার কাছে আমাদের যে দায়বদ্ধতা আছে তা পূরণ করার প্রয়োজনেই এই নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে' বক্তব্য থেকে উদ্দেশ্য পরিষ্কার। দায়বদ্ধতা এদের দু'টো। এক, কৃষি ক্ষেত্রকে ব্যক্তিগত পুঁজিঅর্থাৎ দেশি - দিদেশি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে ব্যবহার করা; দুই, ঝি বাণিজ্য সংস্থার সর্তাবলীকে বাস্তবায়িত করা। কেন্দ্রের সরকারের পাশাপাশি সেদিন রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিরাও দেশি - বিদেশি পুঁজির স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রে একটা নয়া পরিকল্পন া গ্রহণের কথা চিন্তা করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'মুক্ত অর্থনীতির ফলে কৃষিক াজে পুঁজি বিনিয়োগের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.৫.৯৭)। 'পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য তাঁরা তখন থেকেই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকেন। এই সময়েই (১৯৯৬ সালে)ভূমিসংস্কার আইনের ১৪ (জেড) ধারার সংশোধন করা হয়, বর্গাদার আইন পরিবর্তিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল--- চা বাগান, রাবার শিল্প ইত্যাদি স্থাপনের জন্য শিল্প মালিকদের জমি সরবরাহ করা। এই কাজে কৃষককে জমি থেকে ছলেবলে উচ্ছেদ করা হয়েছে, বর্গাদারেরা বিতাড়িত হয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকারের এই ধরনের কাজ তখন শিল্পমহলের বাহবা কুড়িয়েছিল। কিন্তু এইসব কার্যত্রমকে খুশি হয়ে শিল্পমহল সমর্থন করলেও তাঁরা বলতে থাকেন, 'এইসব পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় কিন্তু যথেষ্ট নয়। চাই একটা সুংসহত পরিকল্পিত উদ্যোগ।' তাই তারা দ াবি জানাতে থাকে, বিজেপি সরকার যেমন জাতীয় কৃষিনীতির মধ্যে দিয়ে দেশের কৃষিক্ষেত্রকে শিল্পেক্ষেত্রের মতই উন্মুক্ত করে দিয়েছে, একই রকমভাবে রাজ্য সরকারও একটা কৃষিনীতি গ্রহণ কক, যার ফলে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে দেশি - বিদেশি বহুজাতিক কর্পে ারেশনগুলির অবাধ অনুপ্রবেশ পথে যতটুকু বাধা এখনও আছে তা দূর করা যায়।

রাজ্য সরকার ওদের এই দাবিকে গুত্ব দিয়েছে। তৎপরতার সঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভাড়া করা হয়েছে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি ম্যাকিনসেকে। কী ধরণের কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করলে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে দেশি - বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ সহজতম হয় সে সম্পর্কে ম্যাকিনসের রিপোর্ট জমা পড়েছে। রাজ্য সরকার সেই সুপারিশের সারাংশ গ্রহণ করে নিজেদের ভাষার চাতুরি মিশিয়ে নয়া কৃষিনীতির খসড়া রচনা করেছে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না রাজ্য সরকারের এই কৃষিনীতি কাদের স্বার্থরক্ষা করবে। সর্বনাশা এই নীতির গায়েরাজ্য সরকার এখন জনদরদের একটা মোড়ক লাগাতে চাইছে। ভাবখানা এমন যে রাজ্যের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের বাস্তব তাগিদ থেকেই তাঁরা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এটা প্রমাণ করতে খসড়া কৃষিনীতিতে ওঁরা বলেছেন, 'রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে সুষম বিকাশের যে প্রক্রিয়া চলছে তাকে আরও শক্তিশালী করাই হবে রাজ্য সরকারের নতুন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।' প্রতিদিন রেডিও, টিভি, খবরের কাগজের ম াধ্যমে ওঁরা গ্রামের গরিব মানুষদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন এর ফলে গরিব চাষির উপকার হবে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, বিদেশে সেই কৃষিপণ্য বিক্রি হয়ে চাষির রোজগার হবে, গ্রামের উন্নয়ন, অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে। এমনভাবে ব্রামফ্রন্ট সরকারের নেতা মন্ত্রীরা বিষয়টাকে উপস্থাপনা করছেন যেন যেসব দেশি - বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি বাংলার কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির থলি নিয়ে বিনিয়োগ করতে আসবে তাদের সব দয়ার শরীর। গ্রামবাংলার মানুষের অর্থকষ্ট সহ্য করতে না পেরে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এরা এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আসছে, যেন এদের কোনও শ্রেণী চরিত্র নেই, যেন এদের শ্রেণীশোষণের কোনও মতলব নেই! এক সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের খয়ের খাঁ রায় বাহাদুর, খান বাহাদুরেরা যেমন সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ ছিল, বর্তমানে কংগ্রেস - বিজেপির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্য সরকারও একইভাবে কৃষিতে বিদেশি পুঁজির গুণকীর্তন করে যাচ্ছে।

বামফ্রন্টের নতুন কৃষিনীতির খসড়া পাঠ করলে মনে হবে রাজ্যের মধ্য নিম্ন-প্রান্তিক কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জীবন কোনও সমস্যা

নেই, তাঁরা বেশ দুধেভাতে আসছেন। কোথাও কোনও সমস্যা সঙ্কট নেই। তাই আশ্চর্যের হলেও এটাই সত্য, ওদের কৃষিনীতির খসড়ায় কোথাও পশ্চিমবঙ্গের কৃষককুলের ভয়াবহ দুরবস্থা সম্পর্কে একটা কথাও নেই। কেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কৃষক জমি হারিয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে, কেন গ্রামীণ ও কৃষি মজুর সর্বস্ব হারিয়ে ফুটপাতে এসে আশ্রয় নিচ্ছে, কেনই বা গরিব চাষি ঋণগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার বেদনাদায়ক পথ গ্রহণ করেছে, সেসব কেন এবং কোন নীতির ফল, এর প্রতিকারের উপায় কী, এসব গুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই খসড়া কৃষিনীতি একেবারেই নীরব। বরং এটা পাঠ করলে মনে হবে শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই বামফ্রন্ট রাজত্বে গ্রাম বাংলায় এক ধরনের স্বর্গরাজ্য কায়েম হয়েছে এবং এই স্বর্গরাজ্যকে আরও পোক্ত করার প্রয়োজনেই ওদের এই নয়া কৃষিনীতির পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার চরিত্র কী এবং কেনই বা ওরা এর বাস্তবায়নে মরিয়া তা বিস্তারিত আলোচনার আগে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে এই সরকার এতদিন কী ভূমিকা নিয়েছে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা যাক।

।। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ।।

সবাই জানেন যে কোনও কৃষকদরদি সরকার যারা কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন আন্তরিভাবে চাইবে, তাদের প্রাথমিক কাজ হবে দুটো। তাদের দেখতে হবে, কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত শিল্প সামগ্রী প্রয়োজন অর্থাৎ সার, বীজ, তেল, বিদ্যুৎ, ডিজেল ইত্যাদি যাতে কৃষকেরা সস্তায় পান তা সুনিশ্চিত করা এবং তারপর উৎপন্ন কৃষিপণ্য যাতে জলের দরে অভাবে বিক্রি না করে দিতে হয় তার ব্যবস্থা করা। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এতদিন এ বিষয়ে কী ভূমিকা গ্রহণ করেছে?

সার - বীজ- তেল - ডিজেল ইত্যাদির কথা তুলব না, কারণ এই সমস্ত পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কথা বললেই রাজ্য সরকার বলবে এই সমস্ত পণ্যের দাম মূলত নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় সরকার বা ব্যবসায়ীরা; সুতরাং রাজ্য সরকার কী করতে পারে! যদিও এই যুক্তি সর্বাংশে সত্য নয়। কেন্দ্রীয় সরকার ফি-বছর ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি করে কিন্তু রাজ্য সরকারও তার উপর সারচার্জ বসিয়ে সেই মূল্যকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই এইসব পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির আংশিক দায় রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে বৈকি। কিন্তু বিদ্যুতের বেলায় তো এই যুক্তি খাটবে না। বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্টন, মূল্যনির্ধারণ সবই রাজ্য সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। এ ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা কী? রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে সেচের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন সবারই জানা। সেই বিদ্যুৎ গ্রামে কৃষকদের কাছে কীভাবে পৌঁছে দিচ্ছে সরকার? বিষয়টা খতিয়ে দেখা যাক।

এ রাজ্যে বিদ্যুৎচালিত পাম্পসেটের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ ২৫ হাজার এর মধ্যে কিছু পাম্পসেট ও কিছু গভীর নলকূপ সরকারি কৃষি দপ্তরের অধীন, যার সংখ্যা ৮-১০ হাজারের মতো, বাকি সমস্ত পাম্পসেটই কৃষকের গাঁটের পয়সা খরচ করে কেনা। এর বেশিরভাগই ৫ অশক্তির শ্যালো বা অগভীর নলকূপ। আর কিছু আছে মিনি ডিপটিউবয়েল বা সাবমার্সিবল পাম্প। এই সবক্ষেত্রে বিদ্যুতের কি ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে তা নীচের সারণিরদিকে দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সারণি - ১

তিন থেকে পাঁচ অশক্তির জন্য বিদ্যুতের বার্ষিক মাসুল

(দার্জিলিং, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে)

অগভীর নলকূল সাবমার্সিবল পাম্প

সাল	টাকায়	শতকরা বৃদ্ধি	টাকায়	শতকরা বৃদ্ধি
১৯৮৫	৯০০.০০	----	----	---
১৯৯১	১৩৮০.০০	৫৪.৫	১৩৮০.০০	----
১৯৯৬	১৬৬০.০০	২০	২৫০০.০০	৮৯
১৯৯৯	৩১৫৬.০০	৯১	৪৭৪৮.০০	৮০
২০০১	৪০৬৪.০০	২৮.৭	৫০৮০.০০	০৮
২০০২	৭৫১২.০০	৫০	৭৬২০.০০	৫০

(অন্যান্য জেলার জন্য)				
১৯৮৫	১১০৪.০০	----	----	---
১৯৯১	১৭০০.০০	৫৪.৫	১৭০০.০০	---
১৯৯৬	২০৪০.০০	২০	৩০৬০.০০	৮৯
১৯৯৯	৩৯০৮.০০	৯১	৫৭৯৬.০০	৮০
২০০১	৫০০৮.০০	২৮.৭	৬২৫২.০০	০৮
২০০২	৭৫১২.০০	৫০	৯৩৭৮.০০	৫০

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিনীতি কৃষকের ভবিষ্যৎ

কী দেখা গেল? ১৮৯৫ থেকে ২০০১ এই ১৬ বছরে ৫ অশ্বশক্তির অগভীর নলকূপের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চার্জ বেড়েছে ৩৯০৪ টাকা এবং তারপর আবার ২৫০৪ টাকা মূল্যবৃদ্ধির সুপারিশ রয়েছে। মিনি ডিপটিউবয়েলের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৫৫২ টাকা ও ৩১২৬ টাকা। ভাবা যায়? এ রাজ্যের ৯৩ শতাংশ জোত অলাভজনক, ৭৩ শতাংশ কৃষক নিম্ন ও প্রান্তিক পর্যায়ের। তারা এই বিপুল পরিমাণ টাকা প্রতি বছর ব্যয় করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনতে পারবে? বুঝতে অসুবিধা হয় না, পারবে না। এবং এই কারণেই দেখা যাচ্ছে গ্রামবাংলার হাজার হাজার চাষি বর্তমানে বিদ্যুতের বিল দিতে পারছে না। ফলে বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিচ্ছে। এইভাবেই সরকার প্রান্তিক কৃষকদের সেচের জল সরবরাহের দায়িত্ব পালন করছে।

কৃষিতে বিদ্যুতের দাম পশ্চিমবঙ্গেই যে সবচেয়ে বেশি একথা গত ৩রা মার্চ ২০০১, দিল্লিতে বিদ্যুৎমন্ত্রীদের বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং স্বীকার করেছেন, কৃষিতে বিদ্যুৎ মাসুল ইউনিট প্রতি ন্যূনতম ৫০ পয়সা ধার্য করার প্রস্তাব অনেক রাজ্যেই মানতে রাজি হয়নি। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পাঞ্জাব। তামিলনাড়ুপাঞ্জাবকে সমর্থন জানায়। পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য ভিন্নমত। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের মাসুল ইউনিট প্রতি ৫০ পয়সার বেশি দরেই বিক্রি হয় (আনন্দবাজার পত্রিকা ৪.৩.২০০১)। '৫০ পয়সার বেশি দরে' নয় অনেক অনেক বেশি দরেই বিদ্যুৎ পশ্চিমবঙ্গের গরিব কৃষকদের কাছে বিক্রি করে থাকে রাজ্য সরকার। লজ্জায় হয়তো সে কথা স্বীকার করতে পারেননি মৃণালবাবু।

কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সস্তা করে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কী, বিদ্যুৎ হল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ফলে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের দাম বাড়ছে দ্রুতগতিতে। কোনওটা বাড়াচ্ছে কেন্দ্র, কোনওটা রাজ্য, কোনওটা আবার রাজ্যের যৌথ মদতে ব্যবসায়ীরা। তাই চাষের খরচ বেড়ে গিয়েছে আগের তুলনায় বহুগুণ। এই খরচ সামাল দিতে চাষিকে চড়া সূদে টাকা ধার করতে হচ্ছে এবং তার পরিণাম যে কী হয়েছে তাতে আমাদের সবারই জানা।

।। ফসলের দাম সরকারি ব্যবস্থা ।।

কষ্টের এই ফসলের ন্যায্য দাম পাবার কি কোনও ব্যবস্থা হয়েছে গত ২৫ বছরে? এক কথায় বলা চলে, না । সেই একই ট্রাডিশান এখনও চলছে। চাষিরা যখন ফসল নিয়ে বাজারে যায়, ফড়েরা পরিকল্পিত ভাবে দাম কমিয়ে দেয়; বাধ্য হয়ে চাষিকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ফড়েদের হাতেই ফসল জলের দরে দিয়ে আসতে হয়। কারণ এই বাস্তব গ্রাম বাংলায় নিত্য দিনের ঘটনা। গ্রাম বাংলায় উন্নয়নের দাবিদার বামফ্রন্ট সরকার এক্ষেত্রে কোনওভূমিকাই পালন করেনি এতদিন। কিন্তু এ বছর ধানের দাম নিয়ে এই সরকার যা করেছে তার তুলনা মেলা ভার।

গত বছরে (২০০২ সাল) রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ধানের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা হয়েছিল, সাধারণ দাম (সরকারি পরিভাষায় FAQ- Fair Average Quality) প্রতি কুইন্টাল মোটা ৫০৩ টাকা এবং স ৫৬০ টাকা। চাষিরা খবরের কাগজে সরকার ঘোষিত এই দামের কথা জেনেছেন কিন্তু বাস্তবের বাজারে তাদের এই ধান বিক্রি করতে হয়েছে ২৭৫ টাকা থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে। কারণ সরকারি দামে ধান কেনার জন্য বাজারে কেউ হাজির ছিল না।

রাজ্য সরকার এই সহায়ক মূল্য ঘোষণা প্রথমে করেছিল ২০০১ সালে ২৩শে নভেম্বর। তখন এক সার্কুলারে বলা হয় মিল মালিকেরা সরকারি দামে চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনবে এবং সরকার মিল মালিকদের কাছ থেকে মোটা চাল ৮৭১.৯০ এবং সরু চাল ৯১৩.৬০ টাকা কুইন্টাল দরে কিনবে। ঠিক হয়, এই প্রক্রিয়ায় সরকার সারা রাজ্যে ৬ লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করবে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হয়ে যায়, চাষিকে ধানের সরকারি দাম দেবার দায়িত্ব মিল মালিকদের। মিল মালিকেরা এই দায়িত্ব তাদের চরিত্রানুযায়ী পালন করেছে। তারা দালালদের সহায়তা সরকারি দল ও নেতাদের সঙ্গে যোগসাজসে পঞ্চায়েত কর্তাদের হাত করে সরকারি দামেধান কেনার সার্টিফিকেট জোগাড় করে কোটি কোটি সরকারি টাকা আত্মসাৎ করছে।

কিন্তু এতো গেল আমন ধানের কথা। বোরো ধানের ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা আরও অভিনব। এ রাজ্যে বোরো ধান চাষিরা ঘরে উঠাতে শু করে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে। মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় সমস্ত ধান চাষিরা ঘরে উঠে যায়। সবাই জানেন, দুর্বিষহ যে অনটনের মধ্যে এ রাজ্যের কৃষককে চাষ করতে হয়, তাতে তার পক্ষে ঘরে ধান ধরে রাখা অসম্ভব। ঘরে ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বিক্রি করে দিতে হয়। রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিরা এটা ভাল করেই জানেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কী ভূমিকা পালন করলেন? অনেক টালবাহনার পর তারা সরকারি দামে ধান কেনার জন্য ১৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেন এবং বরাদ্দ সেই টাকায় ধান কেনা শু করলেন জুন মাসের শেষদিকে, যখন গরিব চাষির ঘরে বিক্রি করার মতো এক দানা ধানও আর অবশিষ্ট নেই। বুঝতে অসুবিধা হয় কি সহায়ক মূল্যের সহায়তা শেষ পর্যন্ত কাদের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে?

পাট, আলু সহ কৃষকদের উৎপাদিত সমস্ত ফসলের ক্ষেত্রেই চলছে একই প্রক্রিয়া। ফসলের লাভজনক দাম পাবার ঘটনা ব্যতিক্রম। বাস্তব হল রক্ত, ঘাম, পরিশ্রমের বিনিময়ে উৎপন্ন ফসল চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাজ্যের কৃষককে জলের দরে ফড়েদের কাছ বিক্রি করতে আসতে হয়। ফলে চাষের খরচ বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে ফসলের লাভজনক দাম পাবার কোনও ব্যবস্থা না থাকার জন্যই চাষি ক্রমাগত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, পরিণামে প্রান্তিক কৃষক ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। যদিও ঘটনা হল, নিদাণ এই বাস্তবকে বামফ্রন্ট সরকারের নেতা - মন্ত্রীরা কোনও মতেই স্বীকার করতে চান না, তাঁদের দাবি, 'গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মান লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।' (গণশক্তি, ১০.৭.০২) 'জীবনযাত্রার মান ও ক্রময়ক্ষমতার' উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটলে চাষির হাত থেকেক্রমাগত জমি চলে যাচ্ছে কী করে তার যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা ফ্রন্টের নেতাই দিতে পারবেন। তাই এ বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে দেখা যাক গত ২৫ বছরে কী অবস্থায় দাঁড়িয়েছে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ।

।। কৃষকের হাত থেকে জমি চলে যাচ্ছে ।।

কৃষি সাফল্যের দাবিদার বামফ্রন্ট সরকারের ২৫ বছরের রাজত্বে এ রাজ্যের জমি মালিকানায় কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে অর্থাৎ কীভাবে আধা মাঝারি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে, অন্যদিকেবড় জোতদারের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা এবার তথ্য সহযোগে বিচার করে দেখা যাক।

সারণি - ২

জমির মালিকের সংখ্যা (লক্ষ)					
বছর	১ হেক্টরের নীচে	১-২ হেক্টর	২-৪ হেক্টর	৪-১০ হেক্টর	১০ হেক্টরের বেশি
১৯৮৫-৮৬	৪২.০৩	১৭.৭৫	৫.১৭	০.৯৪	০.০১
১৯৯০-৯১	৪৬.৩৯	১১.০৭	৪.৫৭	০.৭৯	০.০১
১৯৯৫-৯৬	৫০.০০	১১.০০	৩.৮২	০.৬০	০.০১

(সুদ্র Evaluation Programme, Evaluation wing, Directorate of Agriculture, Govt. of West Bengal)

এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে (সারণি ২) ১৯৮৫-৮৬ থেকে ৯৫-৯৬, এই দশ বছরে এই রাজ্যে এক হেক্টরের (১ হেক্টর ঞ২৪৭ শতক ঞ৭১/২ বিঘা প্রায়) কম জমির মালিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ লক্ষ ১০ হাজার। অন্যদিকে১-২ হেক্টর জমির মালিকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৭৫ হাজার, ২-৪ হেক্টর জমির মালিকের সংখ্যা কমে গিয়েছে ১লক্ষ ৩৫ হাজার এবং ৪-১০ হেক্টর জমির মালিকের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৩৪ হাজার। অর্থাৎ এক কথায় এই সময়ে প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হ্রাস পেয়েছে ক্ষুদ্র আধামাঝারি ও মাঝারি কৃষকের সংখ্যা। কিন্তু শুধু সংখ্যাতেই এরা হ্রাস পায়নি, তাদের হাতে জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ৩নং সারণি

থেকেই এ ছবি স্পষ্ট।

সারণি ৩

বছর	জমির মালিকের সংখ্যা (লক্ষ)			
	১-২ হেক্টর	২-৪ হেক্টর	৪-১০ হেক্টর	১০ হেক্টরের বেশি
১৯৮৫-৮৬	১৭.৫৩	১৩.৮২	৪.৮৬	২.০০
১৯৯০-৯১	১৬.৯৪	১২.৬৯	৪.২৫	২.০২
১৯৯৫-৯৬	১৬.২৪	১০.৪৬	৩.১৬	২.০৩

।। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিনীতি কৃষকের ভবিষ্যৎ ।।

দেখা যাচ্ছে, ১-২ হেক্টর জমির মালিকের হাতে ১৯৮৫ - ৮৬ থেকে ১৯৯৫ - ৯৬, এই দশ বছরে জমি কমে গিয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হাজার হেক্টর, ২-৪ হেক্টর জমির মালিকের ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার হেক্টর ৪-১০ হেক্টর জমির মালিকের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ১ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর। অর্থাৎ আলোচ্য দশ বছরে ক্ষুদ্র - আধামাঝারি ও মাঝারি কৃষকের সংখ্যা যেমন কমেছে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার তেমনি এই পর্যায়ের কৃষকের হাত থেকে জমি চলে গিয়েছে ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার হেক্টর বা প্রায় ৪৭ লক্ষ ৬৩ হাজার বিঘা। তাই এই ধরনের কৃষক সংখ্যায় কমেছে, জমি হারিয়েছে ব্যাপক হারে। এই নির্মম সত্য অস্বীকার করা চলে কি? কিন্তু এটা হল সত্যের অর্দ্ধেক। বাকি অর্দ্ধেকও কম গুত্বপূর্ণ নয়। সারণি ২ ও ৩ এর দিকে একটু লক্ষ্য করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, ওই একই সময়ে ১০ হেক্টরের উর্দ্ধে জমির মালিকের সংখ্যা না বাড়লেও তাদের হাতে জমি বেড়েছে প্রায় সাড়ে বাইশ হাজার বিঘা। অর্থাৎ ধনী চাষিদের হা৪তে জমি কেন্দ্রীভবনের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বেশি দিন আগের কথা নয়। ১৯৯৫ সালে বর্ধমানের মুখ্য কৃষি আধিকারিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে সমস্ত ভূমিহীন কৃষককে এই জেলায় জমি দেওয়া হয়েছিল তাদের বর্তমান অবস্থা কী? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচী অনুযায়ী পাট্টাপ্রাপ্ত এই জেলায় ২,২৪,০৫১ জন কৃষকের ৬০ শতাংশ যাঁরা প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমির মালিক ছিলেন, তাঁরা তাঁদের জমি বিত্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত্রেতারা হলেন বড় ভূস্বামী বা গ্রামাঞ্চলের নতুন ধনী, যারা আজকাল কৃষিকাজে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ করছেন (The Statesman, 25.2.95)। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের ১৩ শতাংশ পাট্টাদার বিভিন্ন কারণে তাঁদের পাট্টাপ্রাপ্তজমি হারিয়েছেন। এর মধ্যে ২.৭৩ শতাংশ পাট্টাদার তাদের জমি বিত্রি করে দিয়েছেন। তা ছাড়া প্রায় ৩.০২ শতাংশ বর্গাদার উচ্ছেদের কারণে জমির উপর তাঁদের অধিকার হারিয়েছেন (Times of India, 23.08.02) তথ্যই দেখিয়ে দিচ্ছে কৃষি ও কৃষকের শ্রীবৃদ্ধির যে দাবি বামফ্রন্ট সরকার করছে তা কতটা অন্তঃসারশূন্য।বলা যায় এই সরকারের অনুসৃত কৃষিনীতি কৃষকের সর্বনাশই ডেকে এনেছে।

।। দেশের কৃষিক্ষেত্রে দেশি - বিদেশি পুঁজির জোটবন্ধন ।।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এদেশের কৃষি পুঁজিবাদী পথেই বিকশিত হয়েছে। পশ্চাদপদতা তার যাই থাক, যতই অনুন্নত প্রথায় চাষ আবাদ হোক, এ দেশের কৃষিপণ্যের পুঁজিবাদী পথে বিকাশের এই প্রক্রিয়ায় বর্তমান ভারতের কৃষিপুঁজি আপেক্ষিক অর্থে অত্যন্ত শক্তিশালী আকার ধারণ করেছে। এরা ভারতের কৃষি ও কৃষিপণ্যের ভুবনীকরণের দাবি তুলছে। ভারতের একচেটিয়া পুঁজি ও শক্তিশালী এই কৃষিপুঁজির জোট বন্ধনের ভিত্তিতেই কৃষি বিকাশে সরকারি অনুদানের সিংহভাগই এর ব্যবহার করে এসেছে। সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে এদেরে মদত দিয়ে এসেছে। সবুজ বিপ্লবের তথাকথিত স্বর্ণযুগের কথাই ধরা যাক। কৃষি শিল্প গবেষণার জাতীয় কাউন্সিল -এর সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'সবুজ বিপ্লবের সময় সার, উচচ ফলনশীল বীজ সেচ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ধনী কৃষকরাই বেশি সুবিধাপেছেয়ে। ফলত অনেক বেশি মুনাফা এই সময়ে তারাই করেছে।' তাই দেখা যাচ্ছে, একদিকে পুঁজিবাদী শোষণের স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রামাঞ্চলে একদল মানুষের হাতে যেমন জমি ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, অন্যদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারি সাহায্যে এই গ্রামীণ পুঁজিপতিরা ত্রমশই ফুলে ফেপে উঠছে। এরই ফলে কৃষিতে পুঁজি সৃষ্টির পরিমাণও বেড়ে গিয়েছে ব্য

াপকহারে। ১৯৯০-৯১ সালে এদেশে কৃষিতে পুঁজি সৃষ্টির পরিমান যেখানে ছিল ৪৫৯৪ কোটি টাকা, ১৯৯৭-৯৮ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০,৯৯৫ কোটি টাকা। লক্ষ্যনীয় এই পুঁজির ৭৯ শতাংশই ব্যক্তিগত (Economic Survey, 1998-99)। শক্তিশালী এই কৃষি পুঁজি শুধুমাত্র আর কৃষিকাজের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে চাইছে না। খাদ্যশস্যের ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষিভিত্তিক শিল্প, পরিবহন, চালকল প্রভৃতির ক্ষেত্রে এরা বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করছে।

দেশের বৃহৎ একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠীও কৃষি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। জমি এখন তাদের কাছে গুত্বপূর্ণ। এই গুত্ব বর্তমানে একটাই যে দেশের সমস্ত অনাবাদী ও পতিত জমিকে ৫০ বছরের জন্য হৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিকে লিজ দেওয়ার দাবি ওরা সরকারের কাছে রেখেছে। কৃষি এখন ওদের কাছে শুধু শিল্প সহায়ক ক্ষেত্র নয়, মুনাফা অর্জনের অন্যতম গুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এই ক ারণে দেশের বৃহৎ পুঁজি কৃষিক্ষেত্রে আরও বেশি পরিমাণে বিনিয়োগের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এই সব পরিবর্তন দেশের কৃষিক্ষেত্রে একটা নতুন জোটবন্ধনের জন্ম দিয়েছে। দেশীয় একচেটিয়া শিল্প পুঁজি ও গ্রামীণ পুঁজির মধ্যে এক অদ্ভুত মৈত্রী দেখা যাচ্ছে। যদিও মনে রাখা দরকার এদের মধ্যে স্বার্থের বিরোধও বর্তমান। তাই দেখা যায় গ্যাট বা নয়া আর্থিক নীতিকে শিল্প পুঁজির বিভিন্ন সংগঠন (সি আই আই, ফিকি, অ্যাসোচেম ইত্যাদি) যেমন সমর্থন করেছে, তেমনি সমর্থন করেছে শারদ যোশীর ক্ষেতকারী সংগঠন বা পাঞ্জাব - হরিয়ানার কুলাক লবি। উভয়েই অর্থনীতির তথাকথিত ঝিায়নের সুযোগ গ্রহণ করতে চ াইছে এবং এই কারণেই নতুন কায়দায়নুতন কৌশলে এরা ভারতীয় কৃষি ক্ষেত্রকে ব্যবহার করতে চাইছে।

গ্রাম শহরে পুঁজিপতিদের এই জোটবন্ধনের সঙ্গে যুত্ত হয়েছে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির স্বার্থ। তাদের মুখপাত্র হিসাবে ১৯৯১ সালে ঝিব্যাঙ্ক ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে এক গুচ্ছ প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল---

১. কৃষিপণ্য বেচাকেনার সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে দিতে হবে।
২. খাদ্যদ্রব্য ভর্তুকি ব্যাপক ভাবে কমাতে হবে।
৩. কী উৎপাদন হবে এবং কোথায় বিত্রি হবে তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সব বাধা দূর করতে হবে।
৪. কৃষি বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে খুশিমতো কাজ করতে দিতে হবে।
৫. জমির উধর্বসীমা আইন তুলে দিতে হবে।

নিজেদের মধ্যে স্বার্থের যতই সংঘাত থাকুক না কেন, একটু খতিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে এই সব সুপারিশের সঙ্গে এদেশের শিল্প ও কৃষিপুঁজির স্বার্থের ঐক্য রয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে, মাত্র ১১ বছরের মধ্যে এদেশে গড়েউঠেছে দেশি - বিদেশি পুঁজির বিশ াল যৌথ উদ্যোগ। ১৯৯১ সালের আগষ্ট মাস থেকে ২০০২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কী কী ক্ষেত্রে এই যৌথ উদ্যোগ গড়ে উঠেছে তা ৪ নং সারণির দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সারণি - ৪

ক্ষেত্র	যৌথ উদ্যোগের সংখ্যা	বিদেশি নিয়োজিত পুঁজি (কোটি টাকায়)
সার	৬৫	২৪৭
চাষের যন্ত্রপাতি	৪৮	৪৫৩
রবার	২১৫	১৩৫৩
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ	৭৪৭	৯২০২
সামুদ্রিক পণ্য	৯৫	৯৩
বনস্পতি	৪৭	২৪৯
ফল- ফুল ও কৃষিভিত্তিক শিল্প	১৮৮৬	৫৩২১
মোট	৩১০৩	১৬৯১৮

সহজে বোঝা যায় ভারতের কৃষি নির্ভর শিল্পের ক্ষেত্রে কি বিপুল পরিমাণ বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ শু হয়েছে। দেশিয় - বিদেশি পুঁজিপতিরা বাজার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আগামী দশকে এদেশে একমাত্র তৈরি খাবারের চাহিদাই দাঁড়াবে প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকার। লগ্নির প্রয়োজন হবে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা। তাদের ধারণায়, বিদ্যুৎ বা টেলিযোগাযোগ শিল্পের চেয়েও অর্থনীতিতে এর প্রভাব হবে অনেক গুণ বেশি। এই ধরনের প্রয়োজন থেকেই ওরা এদেশে কৃষিপণ্যের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, তার চরিত্রকে পাল্টে দিতে চাইছে। ওদের বক্তব্য হল---

১. এদেশের কৃষিতে এত দিন ধরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর যে জোর দেওযা হয়েছে তার পরিবর্তন করতেহবে।

২. কৃষিপণ্যকে রপ্তানিমুখি করতে হবে।

৩. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বা কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দিকে লক্ষ্য রেখেই কৃষি পণ্য উৎপাদন করতে হবে।

দেখা যাচ্ছে এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দেশে কৃষিপণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক, গুজরাট, রাজস্থানে রেপসিড, সয়াবিন, সূর্যমুখী, তেলবীজ ইত্যাদি কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। গমের জায়গাটা টম্যাটো, ধানের জায়গায় ফুলচাষ প্রাধান্য পাচ্ছে। কেরলের বনাঞ্চল ও ধান জমির একটা বড় অংশকে রবার, কফি ও নারকেল বাগিচায় রূপান্তরিত গরা হচ্ছে।

ফল কী হয়েছে? শুধু কর্ণাটকেই ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ১০,৯৫৯ জন কৃষক আত্মহত্যা করছে। এই আত্মহত্যার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, 'The village as an institution has crumbled under the pressure of commercialization,' (EPW 29.06.02)। অর্থাৎ বাণিজ্যিকীকরণের চাপে গ্রাম ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। পাঞ্জাব অন্ধ্রেও একই অবস্থা। সেখানেও আত্মহত্যার মিছিল। এখন এই নীতিই এরাজ্যে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বামফ্রন্ট সরকার।

দেশি- বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি সম্প্রতি রাজ্য সরকারের কাছে তাদের পরিকল্পনা পেশ করেছে। কারগিল ইন্ডিয়ার রপ্তানি বিভাগের প্রধান সঞ্জীব আসথানা বলেছেন, 'আমরা আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চাল সংগ্রহের কথা ভাবিনি। আমরা জানতে চাই পশ্চিমবঙ্গ আমাদের কী দিতে পারে। তারপরই আমরা বিচার করব, সেগুলো আমাদের চাহিদা মেটাবে কিনা।' মার্কিন এই কোম্পানি রাজ্যের কৃষি থেকে কীভাবে মুনাফা করা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শু করেছে। ম্যাকিনসেও তাদের রিপোর্ট বলেছে এখনই দশটা দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। ম্যাকিনসেকৃত তালিকাটি এরকম---

লগ্নিকারী	ক্ষেত্র	পরিকল্পনা	
		লগ্নির পরিমান (কোটি টাকা	আদায় (কোটি টাকা
১। র‍্যালিজ (টাটা)	ক) খাদ্যের খুচরা বিক্রি খ) ফল ও সবজি খাদ্য	৮০	বছরে ৫০
২০	উল্লেখ নাই		
২। সুবীক্ষা		উল্লেখ নাই	বছরে ১০০
৩। এনডিডিবি	ফল ও সবজি	১৫০	দিনে ৭৫০
৪। এইচ এল এল	টমাটো ও ফল প্রসেসিং	৫	উল্লেখ নেই
৫। কারগিল	চাল রপ্তানি	১২৫	উল্লেখ নেই
৬। ডাবর ও পেপসি	আনারস ও লিচু প্রসেসিং		
৭। আই টি সি	চিংড়ি প্রসেসিং	৩ বছরে ৩০	৩ বছরে ৩০০
৮। ঈগল ইন্ডাষ্ট্রিজ	পোলট্রি	৭০	বছরে ২৫০
৯। ভেঙ্কটেশ্বর	পোলট্রি	১৫	বছরে ৫০

এ রাজ্যের চালকে কেমন করে ব্যবহার করবে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি তার পরিকল্পনা এই রকম---

কোম্পানি	লক্ষ্য
১ । কারগিল	পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভাল চাল সংগ্রহ করে বাংলাদেশ, আফ্রিকায় রপ্তানি করা, এবং রাজ্যকে দামি বাসমতি ও স চালের উৎস হিসাবে গড়ে তোলা।
২। কাগিল ফুড	তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের জন্য দামি চাল সংগ্রহ করা।
৩। আই টি সি	বাংলাদেশ বিক্রির জন্য ভাল চাল সংগ্রহ করা।
৪। এইচ এল এল	নিজেদের ব্র্যান্ডের চাল (দার্জিলিং চাল) ভারতে ও বাইরে বিক্রির ব্যবস্থা করা

বুঝতে অসুবিধা হয় না পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রকে তাদের মুনাফার স্বার্থে ব্যবহার করতে পুঁজিপতিরা কতটা উদগ্রীব। তাদের এই স্ব ার্থ ও চাহিদাকে ভাষা দিতেই রাজ্য সরকার রচনা করেছে কৃষিনীতির নয়া খসড়া এবং তাকেই উন্নয়নমুখী ও জনমুখী নীতি বলে চ ালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

১. এতদিন ধরে এই রাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর জোর দেওয়ার যে নীতি অনুসৃত হচ্ছিল তার পরিবর্তন করতে হবে। বিশেষ করে তৈলবীজ, ডাল, ফল, শাকসবজি, ফুল এবং অন্যান্য অ-খাদ্য উৎপাদনের উপর জোর দিতে হবে।

২. পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৬১ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধানচাষ হয়। উৎপাদনের হার হেক্টর প্রতি দেড়গুণ করেধানচাষের জমির পরিম াণ কমিয়ে আনতে হবে ৪৮ লক্ষ হেক্টরে। বাকি ১৩ লক্ষ হেক্টর জমি ওই সমস্ত বানিজ্যিক ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

৩. নানা ধরণের বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন ও বিপণনের জন্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ জোন তৈরি করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কিমের সাহায্য নিয়ে নানা ধরনের বাণিজ্যিক ফল- ফুল উৎপাদন ও বিপণন করবে।

৪. বাণিজ্যিকভাবে ফসল উৎপাদনের জন্য দেশী - বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সাথে কৃষকদের এক ধরনের চুক্তি হবে এবং তার ফলেই কৃষক ভূমিব্যবহার, ফসল উৎপাদন বা বাজার সম্পর্কে সর্বাধুনিক প্রকৌশলের অধিকারী হবে।

৫. আর এই সমস্ত কাজে চাষী ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করবে পঞ্চায়েত। জেলা প্রশ াসনকেও এই পরিকল্পনার অংশীদার করতে হবে।

এই হল বামফ্রন্ট সরকারের নয়া কৃষিনীতির মোটামুটি সারমর্ম। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে অসুবিধা হবেনা যে, এই কৃষিনীতিতে দেশি - বিদেশি পুঁজির মুনাফার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনের দিকেইজোর দেওয়া হয়েছে। আর তা করা হবে তাদের সঙ্গে র াজ্যের ক্ষুদ্র কৃষকদের এ ধরনের চুক্তির বিত্তিতে। বলা হচ্ছে, 'পারস্পরিকবিশ্বাসের উপর ভর' করেই এই চুক্তি-চাষ চলবে। প ারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভর করে নাকি নতজানু হয়েই বাংলার কৃষককে এই চুক্তি-চাষ করে সর্বস্ব খোয়াতে হবে। এবার সেই সেই বিষয়েই আলোকপাত করা যাক।

।। চুক্তিতে চাষ কেন, কার স্বার্থে ।।

রাজ্য সরকার যখন চুক্তি চাষের জয়গানে মুখর তখন আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছেন বহুদিন আগেকার বাংলার নীল চাষিদের দুর্দশার কথা। কারণ তারাও নীলকর সাহেবদের সঙ্গে চুক্তিতেই চাষ করতেন। কিন্তু কেমন ছিল সেই চুক্তি? বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানির মফঃস্ বল ম্যানেজার টমাস লারমুর ১৮৬০ সালে নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতেগিয়ে বলেছিলেন, 'বাংলার চাষিদের জমিতে, তাদের অতিরিক্ত শ্রমে আমরা সারা পৃথিবীর বাজারে ব্রিটেনের জন্য নীলের এক বিশাল বাজার তৈরি করেছি এবং বাংলার মাত্র দুটো জেলা থেকেই ৩ কোটি পাউন্ডলাভ করেছি। কীভাবে ? যখন বাজারে নীলের দাম মন প্রতি ১০ থেকে ৩০ টাকা, তখন দাদনচুক্তি অনুসারে চাষি প াচ্ছে ৪ টাকা। এর ফলে কী হয়েছিল? আমাদের অধীনে দাদন প্রথায় যে ৩৩,২০০ জন রায়ত নীল চাষ করে, তাদের মধ্যে ২৪৪৮ জন রায়ত দাদন শোধই করতে পারেনি; তারা তাদের বোনা নীলগাছ কুঠিতে পৌঁছে দেয় বিনা পয়সায় এবং নিপায় হয়ে পরের

বছরের জন্য একই শর্তে নীল চাষে দানপত্রে দস্তখত করে।' নীলচাষের সেই কালো দিন কি রাজ্য সরকার আবার ফিরিয়ে আনছে চাইছে?

সাধারণত বহুজাতিক পুঁজি ইউরোপ, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা বা আফ্রিকার দেশগুলিতে বড় বড় খামারের মালিক হয়ে আধুনিক প্রথায় চাষ করে। বড় বড় খামারের একটা মস্ত সুবিধা হল, সেখানে যন্ত্র ব্যবহার ব্যাপকভাবে করা যায় এবং এর ফলে উৎপাদনের হারও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সুবিধা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে ওরা চুক্তি প্রথার চাষের পরিকল্পনা করছে কেন? ম্যাকিনসের রিপোর্টেই এর উত্তর মিলবে। সেখানে বলা হচ্ছে---- 'With the increase in Labour cost these Companies are moving away from managing Captive farming where they work closely with independent farmers.' অথাৎ মজুরির খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে বহুজাতিক পুঁজিরা জমির মালিক হয়ে বড় বড় খামার তৈরির পথ থেকে ক্রমশই চুক্তি - চাষের দিকে সরে যেতে চাইছে। ওরা দেখেছে, এই প্রথায় ওদের লাভ হবে তিন ধরনের---

১. এই প্রথায় মজুরি খাতে খরচ হবে না এক পয়াসও। ছোট চাষি নিজেরাই চাষ করবে। বহুজাতিকরা তাদের কাঙ্খিত পণ্য পেয়ে যাবে

২. খুশিমতো চুক্তি বাতিল করা যাবে। বহুজাতিক কোম্পানির চাহিদা মতো মুনাফা হলে চুক্তি বহাল থাকবে, না হলে বাতিল। শিল্পের যেমন ওরা Exit Policy -র দাবি জানাচ্ছে, অর্থাৎ যখন খুশি পুঁজির অন্যত্র চলে যাওয়া, চুক্তি - চাষ ওদের হাতে সেই সুযোগতুলে দিচ্ছে।

৩. এই প্রথায় জমি যেহেতু চাষির, তাই তার থেকে অল্প সময়ে সর্বোচ্চ মুনাফা কামিয়ে জমিকে যথেচ্ছ ব্যবহারে বন্ধ্যা করে ফেলে ওরা সরে পড়বে।

দেখা যাচ্ছে এই প্রথায় চাষই ওদের স্বার্থের পক্ষে সব থেকে অনুকূল।

পশ্চিমবঙ্গের আর একটা বিশেষ পরিস্থিতির কথাও ওরা মাথায় রাখতে বাধ্য হয়েছে। এ রাজ্যে ৯৩ শতাংশ জোতই হল ক্ষুদ্র জোত এবং এই জোতগুলিতে কৃষি জমির পরিমাণ রাজ্যের মোট কৃষি জমির ৭২ শতাংশ। তাই এ রাজ্যে রাতারাতি বড় জোত গঠনেও অসুবিধা রয়েছে। আবার এই রাজ্যে বেনামি জমি উদ্ধার আন্দোলনের ফলেই ভূমিহীনেরা জমির মালিক হয়েছেন। কৃষক আন্দোলনের চাপে এই রাজ্যে কয়েকবার জমির উর্ধসীমা আইন পাল্টেছে। কৃষক আন্দোলনের এই অতীত ঐতিহ্যের কথাও ওদের মাথায় রাখতে হচ্ছে। এই সমস্ত কারণে রাজ্য সরকারের পক্ষে এখনই বহুজাতিক পুঁজির হাতে তাদের কাঙ্খিত পরিমাণ জমি তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। এই অসুবিধার কথা ম্যাকিনসে রিপোর্টও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ছোট কৃষকদের জমি দেওয়ার আন্দোলন তীব্র হওয়ার কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিশাল বিশাল খামার গড়ে তুলবার মতো জমি পাওয়াই এই সমস্ত কোম্পানিগুলির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।'

এই অসুবিধা এবং চুক্তি চাষের বিশেষ সুবিধা--- সব মিলিয়েই বহুজাতিক পুঁজি মনে করচে মালিকানার ভিত্তিতে বড় খামার গড়ে তোলার চেয়ে ছোট ছোট অসংখ্য কৃষকের সঙ্গে চুক্তিতে যাওযাই সুবিধাজনক। বামফ্রন্ট সরকারও তাই এই প্রথায় চাষের জয়গান গাইতে শু করেছে।

চুক্তিতে এই চাষ গ্রামবাংলায় কৃষকজীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে। লিজ প্রথায় চাষ এখনও এই রাজ্যে আইনসঙ্গত নয়। কিন্তু বাস্তবে বহু আগেই এই প্রথায় চাষ শু হয়েছে এই রাজ্যে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩৫ টি ব্লক ও মেদিনীপুর জেলার ১৫টি সমুদ্র উপকূলবর্তী ব্লকে গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল সব মাছের ভেড়ি। এইসব ভেড়িতে প্রধানত চিংড়ি ও কাঁকড়ার চাষ হয়ে থাকে। গ্রামীণ জোতদারেরা ছোট ছোট জমির মালিকদের জমি মৌখিকভাবে লিজ নিয়ে জমিতে লবণাক্ত জল ঢুকিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম দু'এক বছর জোতদারেরা কৃষককে শর্তমতো টাকা যথাসময়ে দেয়। কিন্তু তারপরেই শু হয়ে যায় আসল খেলা। ইতিমধ্যে জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ায় ওইজমিতে অন্য কোনও ফসলের চাষ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়েই ছোটজমির মালিকদের সেখানে বড় জোতদারের দয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়। এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বহু জায়গায় ভেড়ি মালিক ছোট চাষিকে তার প্রাপ্য টাকা এমনকি জমিক অধিকার থেকেও গায়ের জোরে বঞ্চিত করছে। উত্তর ২৪ পরগনায় সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে গেলেই মর্মান্তিক এই প্রক্রিয়ার বহু নজির পাওয়া যাবে। জমির মালিক জমির উপর তার বৈধ অধিকারের কাগজপত্র নিয়ে সরকারের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে, আবেদন জানাচ্ছে। কিন্তু কোনও সুরাহাই হচ্ছে না। জমি সে ফিরে পাচ্ছে না, চুক্তিমতো টাকাও মিলছে না। এই হল নিষ্ঠুর বাস্তব।

।। কেমন সেই চুক্তি ।।

রাজ্য সরকারের নেতা - মন্ত্রীরা বলতে পারেন, সরকারি উদ্যোগে চুক্তিতে যে চাষ শু হবে তা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত, সুতরাং তাতে অ াশঙ্কিত হওয়ার কী আছে? আমরা বলি, আশঙ্কার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, আইন এ রাজ্যের কৃষককে বাঁচাতে পারবে না। বিষয়টা একটু তলিয়ে বোঝা যাক। এই যে চুক্তি প্রথায় চাষের কথা বলা হচ্ছে, তা কৃষকের সঙ্গে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির চুক্তি। সেই চুক্তির ধরন কী রকম হবে? সরকারি খসড়াতে এ সম্পর্কেবিস্তারিত কিছু নেই। কিন্তু এই খসড়ার উদ্ভব যেখান থেকে সেই ম্যাকিনসে রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলা হয়েছে চুক্তির ধরন হবে এই রকম---

১. জমিতে কী ধরনের ফসল ফলানো হবে তা ঠিক করবে বহুজাতিক কোম্পানি।

২. জমিতে কী ধরনের বীজ, সার, তেল, জল কী পরিমাণে দিতে হবে তাও ঠিক করবে ওরা।

৩. প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূলধন নির্দিষ্ট সুদে চাষিকে ঋন দেওয়া হবে।

৪. ফসল ওঠার পর কিছু অংশ নির্দিষ্ট দামে, বাকিটা বাজার দরে চাষির কাছ থেকে কিনে নেওয়া হবে।

৫. প্রাকৃতিক বা অন্যান্য কারণে ফসলের ক্ষতি হলে তার দায়ভার কোম্পানি বহন করবে না, সমস্ত দায় চাষিকেই বহন করতে হবে।

চুক্তির এই ধরন লক্ষ্য করলেই সহজে বোঝা যাবে, এর সমস্ত শর্তই কৃষক স্বার্থ বিরোধী। অন্য সমস্ত শর্ত বাদ দিয়ে শেষ দুটো শর্তের কথাই ধরা যাক। বলা হচ্ছে, 'ফসল ওঠার পর বাজার দরে চাষির কাছ থেকে ফসল কিনে নেওয়া হবে।' কিন্তু প্রশ্ন হল এই 'বাজার দর' নিয়ন্ত্রণ করবে কারা এবং কীভাবে? সন্দেহের অবকাশ নেই এটানিয়ন্ত্রণ করবে বহুজাতিক কোম্পানি। তারা যে দর বেঁধে দেবে সেই দরেই চাষিকে ফসল বিক্রি করতে হবে। এখনবিক্রি করতে হয় ফড়েদের কাছে, তখন বিক্রি করতে হবে ওদের কাছে, পার্থক্য এই যা। আর এই বহুজাতিক কোম্পানিগুলি নিজেদের মুনাফা কমিয়ে চাষির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে, তা কি বিশ্বাস করা যায়?

চুক্তির এমনই মহিমা, প্রাকৃতিক কারণে ফসল মার খেলেও দায়ী চাষিরা, কোম্পানি কোনও দায় বহন করবে না। ফলে কৃষক এক ব ার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে সে ঋণ পরিশোধ করা তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। তাই নামে মালিক থাকলেও ঋণগ্রস্ত বাংলার কৃষক এই সমস্ত বহুজাতিক কোম্পানির ঋণ জালে আটকা পড়ে হাঁসফাঁস করবে, এর থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় তার থাকবে না। ফলে কোম্পানি যা বলবে তাই তাকে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুরগি চাষিদের কণ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সবাই জানেন, মুরগি চাষের ক্ষেত্রে জমি, ঘর ও পরিশ্রম চাষির, বাচচা খাবার ওষুধ ইত্যাদি যোগায় বহুজাতিক কোম্পানি। মুরগি তৈরি হবার পর কী দামে বিক্রি হবে তা ঠিক করে ওই বহুজাতিকের এজেন্টরা। আবার সেই ইচছা করলে মুরগি নাও কিনতে পারে। মুরগি রোগে মারা গেলে দায় চাষির। অর্থাৎ বহুজাতিক কোম্পানির লাভ দ্বিবিধ। মুরগির বাচচা, খাবার, ওষুধ বিক্রি করে লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈরি মুরগি বিক্রি করে লাভ। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই তার কোনও ঝুঁকি নেই। ষোল আনা ঝুঁকি চাষির। তারই সর্বস্ব চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যে মুরগি চাষের ক্ষেত্রে ছোট ছোট চাষি ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে, অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফার পাহাড় ক্রমশইস্ফীতহচ্ছে। কি সুন্দর অলিখিত চুক্তি বলুন তো? লাভ আমার লোকসান তোমার। এই ধরনের চুক্তিই এবার রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে সর্বত্র চালু হতে যাচ্ছে।

।। রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য উৎপাদন করার স্বার্থে ।।

রাজ্যসরকারের কর্তাব্যক্তিরা বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী প্রচার করছেন, বিশ্বায়নের বর্তমান পর্যায়ে শুধু প্রথাগত খ াদ্যশস্য উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, কৃষককে আন্তর্জতিক বাজারের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে; তাহলেই বাংলার কৃষক আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারে তার পণ্যের লোভনীয় দাম পাবে, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ঘটবে দ্রুতগতিতে। দেশি - বিদেশি পুঁজির ব্যাপক বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য উৎপাদন করলেই কৃষকের উন্নয়ন ঘটবে? এই নীতি অবলম্বন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারা বহুদিন আগে থেকেই কৃষিপণ্য উৎপাদন করছে তাদের অভিজ্ঞতা কী? কী অভিজ্ঞতা আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের? মেক্সিকো, হণ্ডুরাস ভেনেজুয়েলা, আর্জেন্টিনা বা সুদান, মরক্কোর অবস্থ া তো এক কথায় ভয়াবহ। লক্ষ লক্ষ ছোট কৃষক সর্বস্ব হারিয়েছেন সেখানে। লক্ষ লক্ষ একর জমি বন্ধ্যা। হন্ডুরাসের অর্দ্ধেক বনাঞ্চল

ধ্বংস হয়েছে। মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সর্বগ্রাসী মুনাফা শিকারের পরিণাম সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে---

'On March 30, 1998, the American Banana Transnational United fruit Company celebrated its 100 years of operations in Central America. For shareholder, both in the United States and this region, it was a day to rejoice. But for thousands of Central Americans it was a day of mourning.

United Fruit received significant land leases, Privileges, tax exemptions, and cheap labor in exchanges for huge amounts of money for Government officials. Thousands of farm workers were dislodged, many other were killed, all these in the name of progress.

…After a hundred years of Banana Production, Central America is barely developed and thousands of its inhabitants have died under slavery conditions.

…Workers live in misery and despair, specially in the areas where hurricanes caused thousand of deaths, destruction of properties, material losses. As always, farmers pay the highest price in this commercial war.

…The multinational corporations that for years have profited from banana productions have discharged thousand of workers. Today, Plantations were filled with unemployed workers who have almost no social assistance' (Annual Report on workers' Rights, Agricultural Workers, 2001).

উন্নয়নের এই নকশা বুদ্ধবাবুদের অজানা নয়। তাঁরা ভাল করেই জানেন--- দক্ষিণ মধ্য আমেরিকা বা আফ্রিকাতে সাম্রাজ্যবাদীরা যে ধরনের উন্নয়ন ঘটিয়েছে ঠিক সে ধরনের উন্নয়নই তারা এ রাজ্যে ঘটাবে। তবে কেন এই ধরনের পরিকল্পনা?

শুধু বিদেশের অভিজ্ঞতাই নয়। এ দেশের তুলা চাষিদের অভিজ্ঞতা কি? আমরা জানি, দেশের অন্যতম প্রধান অর্থকারী ফসল তুলা। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই এই তুলা চাষ হয়ে থাকে। গুণমানের দিক দিয়ে ভারতীয় তুলা বিশ্বের অন্যতম সেরা। বিশ্ববাজারে এর চাহিদা প্রচুর। এই কারণে এ দেশের তুলা লবি (অর্থাৎ তুলা চাষের সঙ্গে যুক্ত কুলাক ও বৃহৎ তুলা কর্পোরেশনগুলি) তুলা রপ্তানির উপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে এসেছে দীর্ঘদিন। এই দাবি মেনেই তুলা রপ্তানির উপর থেকে সমস্ত বিধি নিষেধ তুলে দেওয়া হতে থাকে ধীরে ধীরে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বড় বড় তুলা কর্পোরেশনগুলি ইচ্ছামতো তুলা রপ্তানি করতে পারবে। এই অধিকার তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। একারণের তুলা রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যায় প্রায় ৪৯০ শতাংশ। এই সময়ে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লেও তা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে তুলার বাজারে জোগানের তুলনায় চাহিদা বেড়ে যায়। চাহিদা জোগানের ভারসাম্যের অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী তুলার দাম বৃদ্ধি হওয়ার কথা এবং তার ফলে তুলা চাষি বিশেষত মধ্য - নিম্ন - প্রান্তিক চাষির উপকৃত হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। তুলা কর্পোরেশনগুলি বাজারের উপর তাদের একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে দাম কম দিয়েছে এবং আগের তুলনায় বেশি দামে তুলা বিক্রি করে মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়েছে। অসহায় চাষিরা তুলা কর্পোরেশনগুলি বেঁধে দেওয়া দামেই তাদের কাছে অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। দেখা গিয়েছে, 'ভারতের তুলা কর্পোরেশন ও মার্কফেড ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসাবে অন্ধ্রপ্রদেশে কুইন্টাল প্রতি পনের'শ টাকায় তুলা কিনেছে যা বিগত বছরগুলির তুলনায়শতকরা ২৫ টাকা কম। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী তুলা চাষিদের আশ্বস্ত করতে বলেছেন, প্রতি কুইন্টাল ২১০০ টাকা দরে অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ তুলা ভারতের তুলা কর্পোরেশনগুলি ও মার্কফেড কিনবে। কিন্তু এই দুটি সংস্থা তা করতে অস্বীকার করে। তারা বলে যে, তারা বাণিজ্যিক সংস্থা, দাতব্য তাদের কাজ নয়। কৃত্রিমভাবে তুলার এই দাম কমানোর ফলে লাভ হয়েছে ফড়ে, মিল মালিক ও বিদেশি তুলা ক্রেতাদের। ৯৬-৯৭ সালে তুলার দাম যেখানে ছিল কুইন্টাল প্রতি ২৩০০ টাকা, এ বছরে তা দাঁড়িয়েছে ১৮০০ টাকায়। চাষিদের মজুত করে রাখার ক্ষমতা নেই। তাদের গুদাম ঘর বা যানবাহনও নেই। তাদের দেনা শোধ করতে হবে। তাই অপেক্ষা করারও কোনও উপায় নেই। আবার শস্য নষ্টও হয়ে যেতে পারে। তাই ফড়েরা যে দাম পায় তার থেকে ২৫-৩০ শতাংশ কম দামেই তাদের শস্য বিক্রি করে দিতে হয়' (Aspects of Indian Economy, Vol. 26-27, p.30-31)।

সবুজ বিপ্লবের স্বপ্নভূমি পাঞ্জাবেও একই ঘটনা। 'দেনার দায়ে পাঞ্জাবের তুলা চাষিরা তাদের জীবজন্তু অর্দ্ধেক দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে, এমন অসংখ্য ঘটনার নজির রয়েছে' (পাঞ্জাব ট্রিবিউন, ১৪.১০.৯৮) ওই পত্রিকা আরও জানাচ্ছে, 'কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ পাঞ্জাবের শতকরা ৯০ জন চাষি ঋণের জালে আবদ্ধ। এ পর্যন্ত ১৩৩টি আত্মহত্যার ঘটনা জানা গিয়েছে' (৪.১.৯৮)। ট্রিবিউনের মতে, 'সরকারি বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী এ পর্যন্ত এক হাজার আত্মহত্যার ঘঠনা ঘটেছে' (ঐ, ২৪.৯.৯৮)।

তাহলে দেখা গেল আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এমন বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য উৎপাদন করেও আধমাঝারি, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষকের নিস্তার নেই। যতক্ষণ না তার কৃষিপণ্য লাভজনক দামে বাজারে বিক্রি করার কার্যকর কোনও সরকারি ব্যবস্থা থাকবে ততক্ষণ অলাভজনক দামে তার পণ্য চাষিকে অভাবি বিক্রি করতে হবেই এবং সেই সুযোগ বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগত পুঁজি বিপুল পরিমাণ মুনাফা ঘরে তুলবেই। এই ব্যাপারটা ঘটেছে তুলা চাষির ক্ষেত্রে। সে যখন দেনাগ্রস্ত হয়ে হাল - বলদ বিক্রি করে আত্মহত্যার পথ গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে, ঠিক তখনই তার উৎপাদিত পণ্য, তথাকথিত সাদা সোনা বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল মুনাফা ঘরে তুলছে দেশি - বিদেশি তুলা কর্পোরেশনগুলো। তাই উৎপন্ন কৃষিপণ্যের রপ্তানিযোগ্যতা আছে কিনা, বিদেশে তার বাজার মিলবে কিনা, এটা একটা বিষয় হলেও, অনেক বড় কথা হল, চাষির অভাবি বিক্রি বন্ধে কোনও সরকারি ব্যবস্থা করা যাবে কিনা। না হলে অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করা যাবে না।

এই সাধারণ কথাটা কি রাজ্য সরকারের অজানা? নিশ্চয়ই না। কিন্তু এই সামান্য কাজটাও তারা গত ২৫ বছরে করে উঠতে পারেনি, আগামী দিনেও করবেন এমন কোনও পরিকল্পনাও নেই। তাঁরা পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির জয়গানে এখন সোচ্চার। তাই স্বচ্ছন্দে বলতে পারছে চাষির উৎপাদিত ফসল রপ্তানিকারকেরা বাজারদরেই কিনবে। মুশকিল হল, গ্রামবাংলার হাটে হাটে ফড়েরা বাজারদরেই চাষির ফসল কিনে থাকে। বুদ্ধবাবুদের পরিকল্পনায় ফড়ের জায়গা দখল করবে একচেটিয়া পুঁজির এজেন্টরা। তারা এমন বাজার দরে চাষির ফসল কিনতে থাকবে যে ঘটি বাটি বিক্রি করে বাংলার চাষিকে কলকাতার ফুটপাতে অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

কিন্তু তিক্ত এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সুখস্বপ্নে মশগুল। নয়া কৃষিনীতির পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সগর্বে আমাদের জানিয়েছেন, 'এই তো কদিন আগে আমি বাড়িতে একটা প্যাকেট পেলাম, খুলে দেখলাম বিদেশে রপ্তানি হওয়া পশ্চিমবঙ্গের লিচু। কী সুন্দর মোড়ক! চিনকে পিছনে ফেলে পশ্চিমবঙ্গের লিচু ইউরোপের বাজার মাত করে ফেলেছে' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১-০৬-০২)। বিদেশে রপ্তানি হওয়া লিচু আবার স্বদেশে এসে কীভাবে বুদ্ধবাবুর অন্দর মহলে ঢুকে পড়ল এ প্রশ্ন না হয় উহ্যই থাক! কিন্তু একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তো তাঁকে করাই যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে ধরে নিলাম এ রাজ্যের হাজার হাজার চাষি ধান চাষকে কুলোয় বাতাস দিয়ে বিদায় করে লিচু উৎপাদনে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং 'সুন্দর মোড়কে ভরা সেই লিচু' চিনকে পেছনে ফেলে ইউরোপের বাজার মাত করল। কিন্তু তারপর? পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ লিচু চাষিরা তাতে দাম পাবে তো? তাদের অবস্থাও অন্ধ্রপাঞ্জাবের তুলা চাষিদের মতো হবে না তো? তাঁরা লিচু সংরক্ষণ করতে পারবে না, বাজার তেজি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার ক্ষমতাও তাদের আয়ত্তের বাইরে। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাজারের সুবিধা গ্রহণের কথা তাদের স্বপ্নেরও বাইরে। তাহলে এই হাজার হাজার চাষির লিচু কিনবে কে? কিনবে হয় সরাসরি বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি, আর নয় স্বদেশি পুঁজির লিচু লবি বা তাদের নিযুক্ত ফড়েরা। যে বছর ফসল ভালহবে সে বছর যদি ওরা বলে লিচুর কেজি ১ টাকা। তখন লিচু চাষিদের বাঁচাবে কে? রাজ্য সরকার তো কোনও দায়িত্ব নেবে না। তাহলে বাস্তবে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে কী রকম? বাংলার কৃষকদের ওরা বহুজাতিক পুঁজির কণার উপর ছেড়ে দিচ্ছে। এবং এইসব পুঁজিপতিরা যে কেমন কণাময় তা এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার কোটি কোটি কৃষকআজ হাতে হাতে উপলব্ধি করছেন। বাস্তবে যা দাঁড়াবে, এ রাজ্যের উর্বর জমি ও শস্তা শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বহুজাতিক পুঁজি তাদের মুনাফা আরও স্ফীত করবে এবং কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হবে।

।। বীজ কোম্পানিগুলির স্বার্থ ।।

আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করার মতো বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন কৃষকদের উৎসাহিত করার পেছনে আরও একটা স্বার্থ কাজ করছে। তা হল দেশি - বিদেশি বীজ কোম্পানিগুলির স্বার্থ । ওরা জানে, সাবেকি চাষের জন্যপ্রয়োজনীয় বীজে মুনাফার হার অনেক কম। বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্কর বীজে এই মুনাফার হার অনেক বেশি। তাই বীজ কোম্পানিগুলি চাইছে অর্থকরী চাষের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করতে। সে কথাগোপনও করছে না ওরা। খোলাখুলি বলছে, 'কৃষকেরা প্রথাগত বীজের পরিবর্তে সঙ্কর বীজের ব্যবহার করলেই আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ পূরিত হতে পারে' ছদ্রতু, ২০.১০.৯৮)। মহেন্দ্র সিড্‌সের ডাইরেক্টর কে আর চোপড়া এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সম্প্রতিকালে সঙ্কর বীজের যে বাণিজ্যিক ব্যবহার আমরা করেছি তার ফলেই এ দেশের বীজ ব্যবসার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অভাবনীয় বিকাশ সম্ভব হয়েছে।" (সূত্র, ঐ) এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে কারগিল, মনসান্তো, দ্যুপোঁ, আই টি সি জেনেকো ইত্যাদি বহুজাতিক পুঁজিরস্বার্থ। হিসাব কষে ওরা দেখেছে দেশের বীজ বাজার থেকে সাবেকি বীজ

শতকরা ৫০ ভাগ অপসারিত করতে পারলে ওদের বাৎসরিক মুনাফা বৃদ্ধি পাবে ৬ হাজার কোটি টাকা। ওরা যে দেশজুড়ে সঙ্কর বীজ ও বাণিজ্যিক চাষের ব্যাপক প্রচলনের পক্ষে হাওয়া তুলতে উঠে পড়ে লেগেছে, এই হল তার প্রধান কারণ।

এই পরিকল্পনায় আর একটা সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য রয়েছে। যদি প্রথাগত বীজকে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত করা যায় তবে চাষিকে বীজের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে বহুজাতিক কোম্পানির উপর। বীজের চরিত্রের উপরই চাষের চরিত্র অনেকাংশে নির্ভরশীল। চাষে কী পরিমাণ জল, সার, কীটনাশক তেল বা অন্যান্য উপাদান লাগে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে বীজের গুণাগুণের উপর। বীজ বহুজাতিক কোম্পানির সম্পূর্ণ করায়ও হয়ে গেলে চাষের এইসমস্ত উপাদানের জন্যে চাষিকে ওদের উপর নির্ভর করতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে, বীজ কোম্পানিগুলি এখন আরশুধু বীজ সরবরাহ করে না, তারা সার, কীটনাশক তেল ইত্যাদিও সরবরাহ করে এবং এইভাবে বীজ - বাজার দখল করে ওরা সমগ্র চাষের প্রক্রিয়াকেই দখল করতে চায়। বহুজাতিক পুঁজির এই সূদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকেই রাজ্য সরকার ক্রমাগত মদত দিয়ে চলেছে। দুঃখের হলেও, এটাই বাস্তব।

বাণিজ্যমুখী চুক্তিভিত্তিক চাষ চালু করতে গিয়ে বহুজাতিক পুঁজি কতগুলো বাস্তব অসুবিধার কথা চিন্তা করছে। যেমন ১। এ রাজ্যের হাজার হাজার কৃষককে চুক্তিভিত্তিক চাষে উৎসাহিত করার জন্য প্রচার চালাবে কে। ২.কোন কোন চাষির সঙ্গে চুক্তি করলে বহুজাতিক কোম্পানির সুবিধা হবে তা নির্ধারণ করবে কে। ৩. চাষিদের যে বাকিতে সার - বীজ - তেল ইত্যাদি পণ্য দেওয়া হবে, যদি দেখা যায় কোনও কারণে চাষি তা শোধ করতে পারছে না,তখন তা আদায় করার দায়িত্ব নেবে কে ইত্যাদি ইত্যাদি। বহুজাতিক কোম্পানির কর্তাব্যক্তি এবং তাদের বিভিন্ন পরামর্শদাতারা দেখেছে এইসব কাজ যদি মাইনে করা লোক রেখে করতে হয় তবে এক দিকে খরচ অনেক, অন্যদিকেচাষিদের সঙ্গে নিত্যদিনের যোগাযোগের অভাবে তা খুব একটা ফলপ্রসূও হবে না। তার থেকে এই কাজে যদি পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করা যায় তবে তাদের প্রভাব খাটিয়ে এক দিকে যেমন প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষকদের চুক্তি - চাষের আওতায় নিয়ে আসা যাবে তেমনি বকেয়া আদায়ের অনেক সুবিধা হবে। অথচ এতে বহুজাতিক পুঁজির কোনও খরচনেই। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পঞ্চায়েত চলে, এবার পঞ্চায়েত চলবে বহুজাতিক পুঁজির কর্তাদের কথায়।

আর একটা কথা। রাজ্য সরকার বলছে, চুক্তি নিয়ে চাষিদের সঙ্গে বহুজাতিক পুঁজির বিরোধ দেখা দিলেপঞ্চায়েতগুলো মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করবে। এদেশের উচচস্তরের আমলা নেতা - মন্ত্রীদের মধ্যে এই বহুজাতিকপ্রভাবের কথা আমরা সবাই জানি। বাস্তবে তাদের কথায় সরকার ওঠে বসে। এই অবস্থায় চাষির সঙ্গে বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলে পঞ্চায়েত কর্তারা শেষ পর্যন্ত কার পক্ষ অবলম্বন করবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

এই কৃষিনীতিতে যে কৃষকের সমূহ সর্বনাশ এটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু ক্ষেত মজুরদের কী হবে? পুঁজি ক্রমশই আরও বেশি করে পুঁজিপ্রধান শিল্পের দিকে ঝুঁকছে। ফলে ছাঁটাই, কর্মসংকোচন, লে - অফ, লক - আউট এখন শিল্প শ্রমিকদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এটা যে শুধু আমাদের দেশে ঘটছে তাই নয়, গোটা দুনিয়ারই এই অবস্থা। এমনকি সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত বছরেই ৪ লক্ষ শ্রমিককে ছাঁটাই করে হয়েছে এবং আরও বহু লক্ষ ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় দিন শুনছে। শিল্পক্ষেত্রে তারা এটা করছে কেন? অন্যান্য বহু কারণের মধ্যে একটা বড় কারণ হল শ্রমখাতে খরচ কমানো। তাহলে প্রশ্ন হবে শিল্পের ক্ষেত্রে তারা যে নীতি নিয়ে চলছে, কৃষিক্ষেত্রে কি তার উল্টোনীতি নেবে? কৃষিক্ষেত্রে কি তারা শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করবে? এই প্রশ্নের একটাই উত্তর, না তাহলে? এই নীতিতে ক্ষেতমজুর কাজ হারাবে ব্যাপক হারে।

ওদের পরিকল্পনায় ধান চাষের জায়গায় অন্যান্য অর্থকরী ফসল ফলাবার কথা বলা হচ্ছে। ধান চাষের এলাকা কমে যাওয়ার ফলে রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনও সঙ্কট দেখা দেবে কিনা এ প্রশ্ন না হয় তোলাই থাক। বিশেষজ্ঞরা নানা দিক দিয়ে এ নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু এই পরিবর্তন গ্রামীণ ক্ষেতমজুরের জীবনে কী বার্তা বহন করে আনবে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

আমরা জানি, ধান চাষ চরিত্রে শ্রমনিবিড়। ধানের বীজ খোলা তৈরি, জমি তৈরি, রোয়া, আগাছা নিড়ানো, সার দেওয়া কীটনাশক ছড়ানো, ধানকাটা - বাঁধা, ঝাড়াই, বস্তাবন্দি করা ইত্যাদি এই চাষের প্রতিটি পর্যায়েই শ্রমিকের প্রয়োজন এবং তা সংখ্যায় কম নয়। ধরা যাক, ধান চাষ বন্ধ করে কলা চাষ করা হল। কলার চারা বসানোর পর মাঝে মাঝে সামান্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ছাড়া তিন বছরে ওই জমিতে শ্রমিকের আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। আম বা লিচু চাষের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। ফলে দেখা যাচ্ছে, ধানের জায়গায় এই সমস্ত চাষের শ্রমিক লাগবে অনেক কম অর্থাৎ ক্ষেতমজুর কাজ হারাবে। কৃষিনীতির খসড়ায় রাজ্য সরকার বলছে, 'এই নীতির উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা।' পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাস্তবের সঙ্গে সরকারি দাবি ও ঘোষণার ফারাক বিস্তর।

রাজ্যে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বাড়ছে, মাথাপিছু কাজের সুযোগ (জনদিন) কমে যাচ্ছে। গড়পড়তা দৈনিক মজুরি কমছে, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে ভয়ানক গতিতে, বাড়ছে অপুষ্টি, অনাহার, আত্মহত্যা। এরপর উন্নয়নের নামে রাজ্য সরকারের এই নয়া পরিকল্পনা গ্রামবাংলায় আরও লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুরকে কর্মচ্যুত করবে, ঠেলে দেবে সর্বনাশের অন্ধকারে।

অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। যতই এদেশে কৃষির তথাকথিত এই ভুবনীকরণ ঘটবে, যতই দেশীয় একচেটিযা পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে জোট বেঁধে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাবে, যতই তারা নিজেদের মুনাফার থলি পূর্ণ করবে, --- ততই দেশের মানুষ বেশি করে দেখবে অভাবনীয় প্রাচুর্যের মধ্যেই তারা অনাহারে, বা অভাবনীয় প্রাচুর্য সৃষ্টির এই পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার জন্যই তারা সর্বস্বহারা। বুঝতে হবে, এই আক্রমণ শুধু কৃষক বা ক্ষেতমজুরদের উপর আক্রমণ নয়, এই আক্রমণ সমস্ত সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ।

এ কাউকেই রেহাই দেবে না। একমাত্র জোটবদ্ধ গণসংগ্রামই এই সর্বনাশের নীল নকশাকে খে দিতে পারে।